পুস্তক সমালোচনা

বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা ঃ বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকট এবং বিকল্প পথের প্রশ্ন---নজরুল ইসলাম, প্রকাশক ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, মার্চ ১৯৮৭। ২০২ পৃষ্ঠা। মূল্য ঃ শোভন---৮০ টাকা, সুলভ---৫০ টাকা।

বইটি লেখকের দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল। ফলে গবেষণাধর্মী করেই পুস্তকখানি প্রণীত। সেজন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যার উপর লিখিত পুস্তক-টিতে উন্নয়ন সম্পর্কে পাঠকদের কোনরূপ ধারণা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা লেখক অনুভব করেন নাই। বর্তমান বিশ্বে 'উন্নয়ন" শব্দটি যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেজন্য উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করলে সম্ভবতঃ বইটির সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেতো। উন্নয়নের সংজ্ঞা বহুবিধ। কেউ বলেন উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তন। আবার কারো মতে এটা বস্তুর প্রবৃদ্ধি। আবার কারো মতে একই সাথে পরিবর্তন এবং প্রবৃদ্ধি। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উন্নয়ন বলতে জনগণের মধ্যে স্থিতিশীল ক্রয়ক্ষমতা বোঝায়। যেহেতু উন্নয়নকে এককভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয় সেহেতু এখানে আমরা বিষয়টিকে আরো সহজ করার জন্য বর্তমান কালের সর্বাধিক প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করছি। সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিধ স্নাইডার এর ভাষায় "অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘমেয়াদী বা অপ্রতিহত বৃদ্ধিকে বোঝায়।" অধ্যাপক মায়ার ও বল্ডউইন বলেন, "যে পদ্ধতির মাধ্যমে দীর্ঘকালে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।" উপরোক্ত সংজ্ঞা ক'টিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে লক্ষ্য করবো যে, সংজ্ঞা ক'টিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ঃ

১। জাতীয় আয় বৃদ্ধি ; ২। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ; ৩। উৎপাদন বৃদ্ধি ; ৪। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ; ৫। জনসেবার মান বৃদ্ধি ও ৬। সম্পদের যথাযথ বন্টন ও ব্যবহার। এই ক'টি দিকের ইংগিত পাই আমরা চার্লস পি কিণ্ডেলবার্গার প্রদত্ত সংজ্ঞায়। তিনি উন্নয়নকে একটু ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "কোন দেশের উন্নয়ন বলতে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া বোঝায়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই দেশের নিম্ন আয় মানুষের বৈষয়িক কল্যাণ সাধিত হবে, দারিদ্রমোচন, নিরক্ষরতা দূর ও শিশুমৃত্যু রোধ হবে এবং অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবে তারা। বেকারত্ব মোচন হবে এবং কৃষি থেকে দেশ আস্তে আস্তে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাবে এবং এইসব লক্ষ্যার্জনের মাধ্যমে নিজেদের

জীবনযাত্রার মান্নয়েন ও দেশগড়ার কাজে আপামর মানুষের মনঃস্তাত্ত্বিক সমর্থন ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে।" যেহেতু জনসাধারণের অংশ গ্রহণ ছাড়া অর্থ-নৈতিক কোন কর্মই সম্পাদন সম্ভব নয় সেজন্য উন্নয়ন শব্দটি বিশ্লেষণের সময় অর্থনৈতিক উপকরণাদি আলোচনার সাথে সাথে মনঃস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপ-করণসমূহও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেজন্যই মায়ার এবং বল্ডউইন বলেছেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উপকরণই যথেষ্ট নয় বরং সামাজিক, মনঃস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক উপকরণের উপর ওরা নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন জনগণের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও উন্নয়নের প্রতি গভীর আগ্রহ। জনগণ যদি অদৃষ্টবাদী হয় এবং উন্নয়নের প্রতি উদাসীন থাকে তাহলে কোন দেশেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। যে কোন দেশের উন্নয়নের সাথে নিম্নের এই উপা-দানগুলো ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ঃ ১। দক্ষ জনশক্তি; ২। জনগণের দৃষ্টিভংগী; ৩। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ; ৪। শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ, যেমন-যোগাযোগ, শক্তি, শিল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি; ৫। শিক্ষা বিস্তার; ৬। মূলধন গঠন; ৭। দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি; ৮। জাতীয় নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক ভূমিকা; ৯। জনসংযোগ নিয়ন্ত্রণ ও ১০। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।

স্বাভাবিকভাবে এই উপাদানগুলো অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। এগুলোর ইতিবাচক বাস্তবায়নের জন্য দরকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও নিরলস প্রচেষ্টার।

পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের লক্ষ্যে কতিপয় নীতি ও কর্মসূচীর একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। আরো সহজ ভাষায় বললে পরিকল্পনা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্য সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে কতিপয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত কর্মকাণ্ডের একটা খসড়া দলিল। পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের পথে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা এবং সেগুলো দূর করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা।

১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই বাংলাদেশে অনুসৃত হচ্ছে পরিকল্পিত উন্নয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি। সেই লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পরই গঠিত হয়েছিল শক্তিশালী পরিকল্পনা কমিশন। পরবর্তী কালে ১৯৮০ সালে দেশে চালু হয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বর্তমানে ১৯৮৫-৯০ সালের জন্য চলছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। আর এইসব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আপাতভাবে প্রতি বৎসরই প্রণীত হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি)। প্রতি বছর এই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মৌল কৌশলও গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু এই সকল পরিকল্পনার বেশ কিছু মুখ্য লক্ষ্যমাত্রা অবাস্তবায়িত থেকে যায়। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে বহুবিধ সমস্যা।

নজরুল ইসলাম "বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা" পুস্তকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তথা উন্নয়নের মৌলসমস্যাসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। দুইভাগে বিভক্ত বইটিতে সর্বমোট দশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। এছাড়া

প্রারম্ভেই রয়েছে গোড়া থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্বলিত একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা। পুস্তকখানা লেখকের কয়েক বছরের গবেষণার ফসল যার প্রথম অংশটি বছর দুই আগে "বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল" নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয় অংশটি সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। বইখানা এ দুই এর পরিমার্জিত সংস্করণের ফল।

বাংলাদেশের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে গিয়ে লেখক এই পুস্তকে যে কথা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন তাহলো স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়েছে এবং সেগুলোতে উন্নয়নের যে সকল লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে এর কোনটিরই পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। যেমন-লেখকের ভাষায় "১৯৮৪-৮৫ সাল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসর। বলা বাহুল্য এই পরিকল্পনার বেশ কিছু মুখ্য লক্ষ্যমাত্রা অবাস্তবায়িত থেকে যাবে। কৃষি উৎপাদনের হার ৫% বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৩.৬%, শিল্পোৎ-পাদন ৮.৪% এর স্থলে হবে ৪.৩%; জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে দাড়াবে ৩.৮ অথচ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫.৪% জাতীয় আয়ের অনুপাত হিসেবে কর আদায়ের পরিমাণ হবে মাত্র শতকরা ৮.৩%, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিলো শতকরা ৯.৫ ভাগ, খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১৭৫ লক্ষ টন, আর প্রকৃত উৎপাদন হবে ১৫৮ লক্ষ টন; পাটের উৎপাদন গড়ে লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ২৫ ভাগ পেছনে থাকবে; রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পাবে শতকরা ৭ ভাগের কাছাকাছি-যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল শতকরা ৮.৬ ভাগ। পরিবার পরিকল্পনার মুখ্যসূচক (সিপিআর) লক্ষ্যমাত্রার এক তৃতীয়াংশ নিম্নে থাকবে এবং সর্বোপরি প্রকল্প এবং পণ্য সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা হতে শতকরা ১.৬ ভাগ কম হবে"। লেখক অবশ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কোন দিকের উপরই আলোকপাত করেন নাই।

উন্নয়ন অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখক সুদূর '৭১ সাল থেকে '৮৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির তুলনামূলক হার, কৃষি উৎপাদনের গতি ও অন্যান্য দিক তথ্যভিত্তিক সারনীর সাহায্যে বেশ চমৎকারভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। বিশ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, "১৯৭৫-৭৬ সালের পর থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেকের নিকট বেশ সন্তোষজনক মনে হতে পারে ঃ কিন্তু একই সময়ে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদন হ্রাসের পটভূমিতে মোটেও সন্তোষজনক নয়।" এরূপভাবে মৎস্য উৎপাদন, সার ব্যবহার, কৃষি যন্ত্র সরবরাহ, শিল্প ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লেখক বর্তমান উন্নয়ন ধারার মৌলদিক নির্দেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রামে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সম্পদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে মূলতঃ ধনী ও অবস্থাশালীদের জন্য। গরীবদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়না। আর সকল প্রকার উন্নয়নের জন্য অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য এক বিশেষ স্থান দখল

করে আছে। এছাড়া আভ্যন্তরীন সূত্রে সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম। উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী দেখানো হয় বৈদেশিক সাহায্য থেকে। বিভিন্ন কারণে লোকদের শহর অভিমুখে গমন, সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ নির্ভরতাও আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবনতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান উন্নয়ন ধারার সংকটের রূপগুলো লেখক নির্দেশ করেছেন পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। বস্তগত উৎপাদন বৃদ্ধির অপ্রতুলতা, অর্থনৈতিক বৈষম্যবৃদ্ধি, দারিদ্র সৃষ্টি, পুষ্টির অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার গতি প্রকৃতি ও বিনিময় হার সংক্রান্ত পরিস্থিতি, উন্নয়ন মডেল হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়াকে গ্রহণের যৌক্তিকতা, ইত্যাদি। অর্থনীতির এসকল ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনার মধ্য দিয়েই পুস্তকের প্রথম অংশের যবনিকা।

দ্বিতীয় অংশ "বিকল্প পথের প্রশ্ন" মূলতঃ প্রথমভাগে বর্ণিত সমস্যাবলীর সমাধানসূচক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেশের অর্থনীতির যে সকল মৌল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এই অংশে যুক্তি সহকারে তার বিপরীত কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ধনিক অভিমুখী অর্থনীতি ও এর ক্ষয়ক্ষতির দিক তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু চতুর্থ পরিচ্ছেদে ধনিক অভিমুখী অর্থনীতি ত্যাগ করে গরীব অভিমুখী হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, দারিদ্রের কষাঘাতে গ্রামের লোক যাতে শহরে না আসে সেজন্য গ্রামোন্নয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি কৌশলের কথা যুক্তি সহকারে বিবৃত হয়েছে।

"পূনর্গঠিত গ্রামের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা" শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিকল্প ধারার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামীন জীবনের পূনর্গঠনের বিষয়টিকে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে রূপদান করার চেষ্টা করেছেন লেখক। দেশের মূল যে সম্পদ অর্থাৎ বিশাল জনশক্তি তার সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমেই গ্রামের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে চাংগা করে তোলা সম্ভব। গ্রামের মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমেই সম্ভব স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

"গ্রামের পূনর্গঠন এবং জমি মালিকানা" শীর্ষক দীর্ঘ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লেখক মার্কসীয় ধারায় ভূমি সংস্কারের সুপারিশ করেছেন। সুষ্ঠু গ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে লেখক যৌথতাভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে এই কর্তৃত্ব ও প্রশাসনকে হতে হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। গ্রামবাসীদের সাধারণ সভাই হবে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী। দুই সাধারণ সভার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এবং অর্থনীতির দৈনন্দিন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য গ্রামভিত্তিক একটি পরিচালনা কাঠামোও গঠন করার সুপারিশ করেছেন লেখক পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়ে। এই সুপারিশ লেখক চীনের অভিজ্ঞ-

তার আলোকেই করেছেন । মার্কসীয় ধারায় ভূমি সংস্কারের সুপারিশ করলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সমস্যাসমূহ লেখক স্বীকার করেন নাই। জমি মালিকানার বিষয়ে যৌথতার যে সুপারিশ লেখক করেছেন তার সম্ভাব্যতাও যাচাই করা প্রয়োজন। বিশেষ করে তৃতীয় পরিচ্ছেদে কোরিয়াকে উন্নয়ন মডেল হিসেবে গ্রহণ করার বিপক্ষে লেখক যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং চৈনিক মডেলে গ্রামীন পুর্ণগঠনের যে কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটি কার্যকর করার সময় এসেছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত, এ কথাটি সর্বদাই আমাদের মনে রাখতে হবে। উন্নয়নের রাজনৈতিক ও মনঃস্তাত্বিক দিকগুলোর কথা ভুললে চলবেনা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও শিল্পায়নের ভূমিকা অনন্য। যেহেতু কৃষির মাধ্যমেই ক্রমবর্ধমান জনশক্তির সবটার সার্থক নিয়োজন সম্ভব নয় সেকারণে প্রয়োজন হবে পুণর্গঠিত গ্রামের কেন্দ্রীভূত সর্বস্তরের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধারায় শিল্প প্রসারের।

লেখক শহরকেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্পের চেয়ে গ্রামীন কুটির শিল্পের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। একটি কথা লেখক অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন তাহলো শিল্প স্থাপনের কৌশলকে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন কৌশলের সাথে একীভূত হতে হবে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। শিল্পোন্নয়নের জন্য মুক্ত বাণিজ্যনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে বেশ জোরের সাথে। উৎপাদন মিশ্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিল্প বিকাশের আশু লক্ষ্য হবে মৌলিক চাহিদামূলক গণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, অন্যদিকে ভোগ্যপণ্যের পাশাপাশি দেশের সম্ভাবনা অনুযায়ী বিভিন্ন মধ্যবর্তী পুঁজিমূলক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও হবে এর লক্ষ্য।

নবম পরিচ্ছেদে লেখক 'উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় একদিকে যেমন শিল্পে ব্যক্তি মালিকানার উপর জোর দিয়েছেন অন্যদিকে ব্যক্তি মালিকানার নামে শ্রেণী বা গোষ্ঠী যাতে গড়ে না ওঠে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে লেখক ব্যাংক ও বৃহদাকার শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় না দেয়ার সুপারিশ করেছেন। বরং রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

দশম এবং শেষ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বৈদেশিক সাহায্যের প্রসংগটি। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর একথা লেখক প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। বৈদেশিক সাহায্যের সাধারণতঃ তিনটি লক্ষ্য লেখক চিহ্নিত করেছেনঃ (ক) ভূ-রাজনৈতিক ; (খ) বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক এবং (গ) মানবিক। যেহেতু বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া আমাদের চলা সম্ভব নয় তাই লেখক মানবিক সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতি। ভূ-রাজনৈতিক উপাদান রয়েছে এমন সাহায্য পারতপক্ষে না গ্রহণ করাই শ্রেয়। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার প্রসংগে লেখকের পরামর্শ হচ্ছে সাহায্যের সর্বোচ্চ দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দক্ষিণ দক্ষিণ সাহায্য বৃদ্ধি করা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধিও লেখকের অন্যতম পরামর্শ।

তার আলোকেই করেছেন । মার্কসীয় ধারায় ভূমি সংস্কারের সুপারিশ করলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর সমস্যাসমূহ লেখক স্বীকার করেন নাই। জমি মালিকানার বিষয়ে যৌথতার যে সুপারিশ লেখক করেছেন তার সম্ভাব্যতাও যাচাই করা প্রয়োজন। বিশেষ করে তৃতীয় পরিচ্ছেদে কোরিয়াকে উন্নয়ন মডেল হিসেবে গ্রহণ করার বিপক্ষে লেখক যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং চৈনিক মডেলে গ্রামীন পুর্ণগঠনের যে কথা বলেছেন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটি কার্যকর করার সময় এসেছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত, এ কথাটি সর্বদাই আমাদের মনে রাখতে হবে। উন্নয়নের রাজনৈতিক ও মনঃস্তাত্বিক দিকগুলোর কথা ভুললে চলবেনা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প ও শিল্পায়নের ভূমিকা অনন্য। যেহেতু কৃষির মাধ্যমেই ক্রমবর্ধমান জনশক্তির সবটার সার্থক নিয়োজন সম্ভব নয় সেকারণে প্রয়োজন হবে পুণর্গঠিত গ্রামের কেন্দ্রীভূত সর্বস্তরের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধারায় শিল্প প্রসারের।

লেখক শহরকেন্দ্রিক বৃহৎ শিল্পের চেয়ে গ্রামীন কুটির শিল্পের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। একটি কথা লেখক অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলতে চেয়েছেন তাহলো শিল্প স্থাপনের কৌশলকে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন কৌশলের সাথে একীভূত হতে হবে এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। শিল্পোন্নয়নের জন্য মুক্ত বাণিজ্যনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে বেশ জোরের সাথে। উৎপাদন মিশ্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই শিল্প বিকাশের আশু লক্ষ্য হবে মৌলিক চাহিদামূলক গণ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, অন্যদিকে ভোগ্যপণ্যের পাশাপাশি দেশের সম্ভাবনা অনুযায়ী বিভিন্ন মধ্যবর্তী পুঁজিমূলক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিও হবে এর লক্ষ্য।

নবম পরিচ্ছেদে লেখক 'উন্নয়নে ব্যক্তি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনায় একদিকে যেমন শিল্পে ব্যক্তি মালিকানার উপর জোর দিয়েছেন অন্যদিকে ব্যক্তি মালিকানার নামে শ্রেণী বা গোষ্ঠী যাতে গড়ে না ওঠে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে লেখক ব্যাংক ও বৃহদাকার শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানায় না দেয়ার সুপারিশ করেছেন। বরং রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের সৎ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

দশম এবং শেষ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে বৈদেশিক সাহায্যের প্রসংগটি। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর একথা লেখক প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। বৈদেশিক সাহায্যের সাধারণতঃ তিনটি লক্ষ্য লেখক চিহ্নিত করেছেনঃ (ক) ভূ-রাজনৈতিক ; (খ) বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক এবং (গ) মানবিক। যেহেতু বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া আমাদের চলা সম্ভব নয় তাই লেখক মানবিক সাহায্য গ্রহণের পক্ষপাতি। ভূ-রাজনৈতিক উপাদান রয়েছে এমন সাহায্য পারত-পক্ষে না গ্রহণ করাই শ্রেয়। বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার প্রসংগে লেখকের পরামর্শ হচ্ছে সাহায্যের সর্বোচ্চ দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং দক্ষিণ দক্ষিণ সাহায্য বৃদ্ধি করা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধিও লেখকের অন্যতম পরামর্শ।

পনের পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সমৃদ্ধ পাঠসূচী অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পাঠ ও গবেষণা চাহিদা পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। পাদটীকা ব্যবহার করা হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ। যথেষ্ট পরিমাণে সারণী বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তুলেছে। মুদ্রণ প্রমাদ খুবই কম। নাম নির্ঘন্টের সাথে বিষয় নির্ঘন্ট থাকলে বইটি আরো সমৃদ্ধ হতো।

অর্থনীতির ছাত্র ছাড়াও দেশের প্রতিটি শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকের জন্য বইটি প্রয়োজনীয়।

—আব্দুল মতিন

পলেটিক্স ডেভেলপমেন্ট এণ্ড উপজেলা—ডঃ আ, ম, ম, শওকত আলী, প্রকাশক ঃ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ডিসেম্বর ১৯৮৬, মূল্য ঃ ১৭৫ টাকা।

ডঃ আ,এম,এম শওকত আলী রচিত এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভমেন্ট ৪৯, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা কর্তৃক ১৯৮৬ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত "পলিটিক্স, ডেভলপমেন্ট এণ্ড উপজেলা" নামক বইটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নামকরণ থেকে বুঝা যায় যে, বইটি সমকালীন বাংলাদেশের তিনটি সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহু আলোচিত বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। এমন দিন নেই যে রাজনীতি, উন্নয়ন আর উপজেলা নিয়ে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় পরিবেশিত হচ্ছে না। তবু ডঃ আলী এ তিন বিষয়কেই তাঁর এ বই-এর বিষ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সংবাদ পত্রে পরিবেশিত খবর আর ডঃ আলীর বই-এ বিষয়বস্তর মধ্যে পার্থক্য এই যে, ডঃ আলী একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মক হিসেবে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে নিজেকে জড়িত রেখে, নির্ভীক চিত্তে তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল পাঠককে উপহার দিয়েছেন। অনেক অজানা বিষয়কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সবার সামনে তুলে ধরে পাঠকের তথা সমাজের মানুষের কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন। সাংবাদিকেরাও অনেক তথ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তবে ডঃ আলীর মত সরকারের ভিতর থেকে এমন নিগূঢ় তথ্য পরিবেশন করার সুযোগ তাঁদের নেই। এ জন্যই বইটিতে সবার নজর পড়েছে।

এবার বইটির বিষয়বস্তুর উপর দৃষ্টি ফেরানো যাক। বইটি আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অধ্যায়গুলো হলো ঃ---

প্রথম অধ্যায় ঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার ;
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ;
তৃতীয় অধ্যায় ঃ জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সংস্কারের পথে বিপত্তিসমূহ ;
চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ সমূহ ;
পঞ্চম অধ্যায় ঃ পরীক্ষামূলক উপজেলা ঃ উন্নয়নকল্পে কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ ;
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উপজেলার বাইরে ;
সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার।

প্রথম অধ্যায়ঃ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারঃ

শুরুতেই লেখক দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল রাজনৈতিক পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রথা হতে মুক্ত হওয়ার ফলে নতুন প্রথার আবির্ভাব তথা জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তবে ভারতের মতো দেশে যেখানে স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে স্থানীয় সরকারকে অধিকতর গণতান্ত্রিক করা ছাড়া বিরাট রকমের কোন পরিবর্তন হঠাৎ করে আনা হয়নি। বার্মায় স্থানীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানে ১৯৪৭ইং সন হ'তে ১৯৭১ইং সন পর্যন্ত অনেক প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির সুপারিশ সত্ত্বেও কোন বড় পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে বাংলাদেশ যখন পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানের অংশ ছিল তখন ১৯৫৮ইং সনে আয়ুব খানের সামরিক সরকার এ দেশে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা চালু করেন এবং জেলা প্রশাসক ও মহকুমা প্রশাসককে যথাক্রমে জেলা ও মহাকুমা পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নিয়োগ করার প্রথা চালু করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার ও বি,এন,পি সরকার স্থানীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালায়। বইটিতে এ অধ্যায়ে আওয়ামী লীগ আমলে গঠিত চৌধুরী কমিটির বিভিন্ন সুপারিশের কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ ও থানা প্রশাসন সম্পর্কে চৌধুরী কমিটির সুপারিশের উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ। তেমনি বি,এন,পি আমলে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক সিনিয়র সার্ভিস পুল, ২৮টি সাব ক্যাডার নিয়ে সিভিল সার্ভিস কাঠামো, থানা উন্নয়ন কমিটি, থানা পরিষদ, গ্রাম সরকার ও ভি,ডি,পি গঠনের কথা সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ কর্তৃক ২৮শে এপ্রিল ১৯৮২ই তারিখ এ্যাডমিরাল খান কমিটির গঠন ও এ কমিটির সুপারিশ সমূহ আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে, তিনি নিজেই এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা সৃষ্টি করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৮২ ইং থেকে ১৯৮৪ইং পর্যন্ত সময়ের প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি ১৯৮২ এর সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮২ সনে আগষ্ট মাসে সরকার কর্তৃক নিকার (ন্যাশনাল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি ফর এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্ম) গঠনের কথা।

লেখক উপজেলা সৃষ্টির ব্যাপারে নিকারের পাশাপশি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের কার্যকরী ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, দ্রুতগতিতে সরকারের আদেশ ও সিদ্ধান্ত সম্বলিত ম্যানুয়াল ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপের উপর প্রতিবেদন ইত্যাদি ছেপে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ। বস্তুতঃ মন্ত্রী

পরিষদ বিভাগের কার্যকরী ভূমিকা ছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার-এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এমনকি উপজেলাতে বিভিন্ন কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ হস্তক্ষেপ করে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে।

লেখক পর্যায়ক্রমে নতুন জেলা সৃষ্টির জন্য সরকার কর্তৃক বিশেষ কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিশেষ কমিটি জেলা সদরের বাইরের মহকুমাগুলোকে নিম্নরূপ জেলায় রূপান্তর করার সুপারিশ করেন।

১ম শ্রেণী ঃ আট বা অধিক উপজেলা নিয়ে নতুন জেলা গঠন ;
২য় শ্রেণী ঃ পাঁচ হ'তে সাতটি উপজেলা নিয়ে নতুন জেলা গঠন ;
৩য় শ্রেণী ঃ চার বা কম উপজেলা নিয়ে নতুন জেলা গঠন ;
৪র্থ শ্রেণী ঃ বিশেষ শ্রেণীর জেলা যথা ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও ময়মনসিংহ।

বিশেষ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ও জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে ৪২টি মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে জেলার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪তে। পটিয়া, রামগড়, কাপ্তাই ও লামাকে পরে জেলায় রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রসংগে তিনি বলেন যে প্রথমে চৌদ্দজন কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা সতেরোতে উন্নীত করা হয়। তিনি উপজেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের ঢাকায় দু'দিনের প্রশিক্ষণের কথাও উল্লেখ করেন।

উপজেলা চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রদানের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, নিকারের সদস্যরা ধরেই নিয়েছিলেন যে ক্ষমতার অপব্যবহার হবে এবং এর প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়েছিল।

(১) সঠিক নেতৃত্বের স্বার্থে উপজেলা চেয়ারম্যানদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করা।

(২) নির্বাচনের পর তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;

(৩) উপজেলা চেয়ারম্যানদের পদ মর্যাদা সংসদ সদস্যদের পদমর্যাদার নিম্নে নির্ধারণ করা।

(৪) নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে একজনকে উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন করা ;

(৫) ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সরকারী কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যানদের সমান ক্ষমতা প্রদান করা।

উপজেলা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত থানা কমিশনার উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করবেন এবং সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে হ'তে থানা কমিশনার নিয়োগ করার বিষয় বিবেচনা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপজেলা নির্বাহী

অফিসার ও উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯৮২ সনের ২৩শে অক্টোবরের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত দ্বারা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তারা প্রথমে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ফলে সরকারকে এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। তবু নির্বাহী অফিসারগণ উপজেলা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করায় অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা যায় এবং উপজেলা নির্বাচনের পর এ অসন্তোষ কিছুটা প্রশমিত হয়।

লেখক জেলা ও উপজেলার মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে সরকার আশা করেন নির্বাচিত জেলা পরিষদ এ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। এই প্রসংগে উল্লেখ্য যে উপজেলা পরিষদের সামরিক বাহিনীর অংশ গ্রহণ নিয়ে বিগত সংসদ অধিবেশনে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয় এবং সরকার জেলা পরিষদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত আপাততঃ স্থগিত রেখেছেন।

এ অধ্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও উপজেলার মধ্যকার দায়িত্ব ও রাজস্ব ভাগাভাগি, উপজেলা পরিষদের ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতা, প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর ভবিষ্যৎ ভূমিকা, উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানীয় লোকজনদের অংশগ্রহণ, উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন, উপজেলা তহবিলের সদ্ব্যবহার ও জবাব দিহির প্রশ্নের উপর বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ জাতীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সংস্কারের পথে বিপত্তিসমূহঃ

এ অধ্যায়ে লেখক জুন, ১৯৮২ সন থেকে ডিসেম্বর, ১৯৮৪ সন পর্যন্ত জেনারেল এরশাদ-এর সরকারকে যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন। জেনারেল এরশাদ-এর প্রশাসনিক সংস্কারকে বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহ সন্দেহের চোখে দেখছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিরোধী রাজনৈতিক দল সমূহের আশংকা ও সন্দেহের কারণ ছিল দু'টি ঃ

(এক) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানগণ একবার স্থলাভিষিক্ত হ'লে তাদের সংসদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সহজেই ব্যবহার করা হবে।

(দুই) উন্নয়ন তহবিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল উপজেলা চেয়ারম্যানগণ স্বাভাবিকভাবেই সরকারের সাথে হাত মিলাবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে তারা জেনারেল এরশাদের শক্তিশালী ক্ষমতার ঘাঁটি হিসেবে কাজ করবে।

জাতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের চরম বিরোধিতা অপর দিকে জেলা সৃষ্টির পদ্ধতির বিরুদ্ধে জনগণের বিকল্প প্রতিক্রিয়া জেনারেল এরশাদ-এর সরকার-কে মোকাবেলা করতে হয়েছিল বলে এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যায় সরকারের ধৈর্য আর প্রজ্ঞাই রাজনৈতিক দলসমূহকে মোকাবেলা করতে সহায়তা করেছে। আর উপজেলা ও জেলা সৃষ্টির ব্যাপারে সীমানা নির্ধারণ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও স্থানীয় জনগণের বিপুল উৎসাহকে সরকার পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। এ প্রসংগে ফেনী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অপ্রীতিকর ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই অপ্রীতিকর ঘটনার বিশদ বর্ণনায় দেখানো হয়েছে জেলা সৃষ্টির দাবী কত তীব্র ছিল। এই ঘটনাগুলো আমাদের জানা। তবু লেখকের নিখুঁত বর্ণনায় এগুলো জ্বলন্ত ইতিহাসে রূপ নিয়েছে।

১৯৮৪ সনে উপজেলা নির্বাচন করার সরকারী প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলো সামরিক আইন তুলে নিয়ে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধি নিষেধ শিথিল করার জোর দাবী জানাচ্ছিলেন। দলগুলোর দাবী ছিল সংসদ নির্বাচনের আগে কোন নির্বাচন না করা এবং উপজেলার বিষয়টি জাতীয় সংসদ-এর উপর ছেড়ে দেয়া।

রাজনৈতিক দলগুলির ঘেরাও আন্দোলন এবং ট্যাক্স ও রাজস্ব প্রদান না করার অসহযোগ আন্দোলনের হুমকি দেয়। সরকার ৬ই এপ্রিল ১৯৮৫ইং তারিখ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল-সমূহ সামরিক শাসনের অধীনে সংসদ নির্বাচন-এ অংশ নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় ১লা মার্চ ১৯৮৫ইং তারিখ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এক বেতার ও টেলিভিশন ঘোষণায় সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ তাৎক্ষণিক ভাবে বন্ধ করেন এবং ২১শে মার্চ ১৯৮৫ইং তারিখ রেফারেণ্ডাম এর তারিখ নির্ধারণ করেন।

নির্ধারিত তারিখে রেফারেণ্ডাম অনুষ্ঠিত হয় এবং জেনারেল এরশাদ ৯৪.৪৭% হাঁ সূচক ভোট পান। পরবর্তী পর্যায়ে ১৬ই ও ২০শে মে ১৯৮৫ইং তারিখ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বাধা বিপত্তি ও সংঘর্ষ সত্ত্বেও এ নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায় এবং ৪৬০টি উপজেলার মধ্যে ২০৭টি উপজেলায় জনদলের প্রার্থীরা জয়ী হয়। আওয়ামী লীগ ও বি,এন,পি প্রকাশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলেও দেখা যায় তাদের ৫৩জন ও ৩৪জন প্রার্থী যথাক্রমে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ প্রশাসনিক প্রেক্ষাপটে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ঃ

এই অধ্যায়ে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফলে বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্ব মেনে নিতে বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের অস্বীকৃতি, উপজেলার কর্মকর্তাদের উপর উপজেলা পরিষদের কর্তৃত্বের ধরণ ও পরিমাণ, উপজেলা কর্মকর্তাদের প্রেষণ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রশিক্ষণ

ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষি-বিদদের নয় দফা দাবীর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এই তিন ক্যাডারের কর্মকর্তারা ২৪ ঘন্টা অবিরাম ধর্মঘট পালন করার হুমকি দেওয়ায় উপজেলা পর্যায়ে এইসব ক্যাডারের সদস্যদের উপর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিয়ন্ত্রণ আদেশ সরকার বাতিল করেন। তবে এইসব ক্যাডারের কতিপয় সিনিয়র সদস্য-দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপের প্রেক্ষিতে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ইতিমধ্যে সামরিক শাসন পুনরায় জোরদার করা হয়। জেনারেল এরশাদ রেফারেণ্ডামে বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের আন্দোলন প্রশমিত হয়। উপজেলা পরিষদের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পরীক্ষামূলক উপজেলাঃ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণঃ

এই অধ্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকা সংযুক্ত করে মন্তব্য করেন যে, বিচার বিভাগ ছাড়া উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য উন্নয়ন, বন সম্পদ, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার কল্যাণ, সমবায় ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রায় সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে এসব উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, কোন উপজেলা পরিষদের বিশেষ কোন আয় বিশেষ কোন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত করে রাখার আদেশ কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর ব্যাপক তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে বটে তবে এ সব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। উপজেলা পরিষদও নিজেকে পরিচালনা করার জন্য কোন বিধি প্রণয়ন করেনি যদিও পরিষদকে সরকারী আদেশের সাথে সামঞ্জস্যহীন নয় এমন বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যানের নির্বাহী ক্ষমতার পরিসর খর্ব করার বিধির অভাবটাই উপজেলা পরিষদকে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এ প্রসংগে লেখক কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সরকারী আদেশ ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে অনেক উপজেলা চেয়ারম্যান নিজের খেয়াল খুশিমত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯৮৩-৮৫তে ৯৩টি গম আত্মসাতের মামলা উপজেলা চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়। নাচোল উপজেলার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি দেখিয়ে

ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষি-বিদদের নয় দফা দাবীর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এই তিন ক্যাডারের কর্মকর্তারা ২৪ ঘন্টা অবিরাম ধর্মঘট পালন করার হুমকি দেওয়ায় উপজেলা পর্যায়ে এইসব ক্যাডারের সদস্যদের উপর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিয়ন্ত্রণ আদেশ সরকার বাতিল করেন। তবে এইসব ক্যাডারের কতিপয় সিনিয়র সদস্য-দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির সাথে আলাপের প্রেক্ষিতে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ইতিমধ্যে সামরিক শাসন পুনরায় জোরদার করা হয়। জেনারেল এরশাদ রেফারেণ্ডামে বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের সদস্যদের আন্দোলন প্রশমিত হয়। উপজেলা পরিষদের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সম্পর্কেও এ অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ পরীক্ষামূলক উপজেলাঃ কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণঃ

এই অধ্যায়ে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়নে উপজেলা পরিষদের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকা সংযুক্ত করে মন্তব্য করেন যে, বিচার বিভাগ ছাড়া উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য উন্নয়ন, বন সম্পদ, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবার কল্যাণ, সমবায় ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রায় সকল প্রকার উন্নয়ন মূলক কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তবে এসব উন্নয়ন মূলক কাজের পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, কোন উপজেলা পরিষদের বিশেষ কোন আয় বিশেষ কোন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের জন্য চিহ্নিত করে রাখার আদেশ কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেন। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর ব্যাপক তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে বটে তবে এ সব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। উপজেলা পরিষদও নিজেকে পরিচালনা করার জন্য কোন বিধি প্রণয়ন করেনি যদিও পরিষদকে সরকারী আদেশের সাথে সামঞ্জস্যহীন নয় এমন বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যানের নির্বাহী ক্ষমতার পরিসর খর্ব করার বিধির অভাবটাই উপজেলা পরিষদকে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এ প্রসংগে লেখক কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সরকারী আদেশ ও নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে অনেক উপজেলা চেয়ারম্যান নিজের খেয়াল খুশিমত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ১৯৮৩-৮৫তে ৯৩টি গম আত্মসাতের মামলা উপজেলা চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়। নাচোল উপজেলার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তিনি দেখিয়ে

দিয়েছেন যে বাহুবলে অফিস ঘেরাও করে একজন উপজেলা চেয়ারম্যান তাঁর অপসারনের কার্যক্রমকে কিভাবে বানচাল করে দিতে পারেন।

এ অধ্যায়ের শেষে তিনি পলাশবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যানের অপসারণের নেপথ্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন। উক্ত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা ছিল ২৩টি যার মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারও অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ উপজেলার বাইরে ঃ

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনার আলোকে লেখক মন্তব্য করেন যে, স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলার বাইরের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন আছে যা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন মাঠ পর্যায়ের সনাতন প্রশাসন এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে তিনি সতর্ক করে দেন যে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর আমলাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস চালানো হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা হতে পারে। তিনি এ প্রসংগে বলেন যে উপজেলা পরিষদের অস্তিত্ব সুসংহত করার জন্য সরকারের নির্বাচিত জেলা পরিষদের কথা চিন্তা করেছেন। তবে সবকিছু নির্ভর করে প্রস্তাবিত জেলা পরিষদের ভবিষ্যতের উপর।

উপজেলা থেকে ইউনিয়ন ও গ্রামে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা এ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনিয়নকে শক্তিশালী করার সাথে সাথে ইউনিয়নের নিম্ন পর্যায়ে গ্রামে জনগণের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দরকার আছে, কারণ বর্তমান ওয়ার্ড প্রথাও গ্রামের সাধারণ মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারছেনা। এ প্রসংগে তিনি স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের কথাও উল্লেখ করেন এবং স্বনির্ভর প্রথা ব্যর্থ হওয়ার কয়েকটি কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

সপ্তম অধ্যায়ঃ উপসংহার ঃ

ডঃ আলী শেষ অধ্যায়ে মন্তব্য করেছেন যে তাঁর এ বই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হল দেশের বর্তমান রাজনৈতিক-প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সবার সামনে তুলে ধরা যা স্থানীয় সরকারের আমূল পরিবর্তন এনেছে। তিনি উল্লেখ করেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার সময় এখনো আসেনি। কারণ উপজেলা এখনও একটা পরীক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান এবং সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসেনি। যা হোক বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়ন কল্পে তিনি কয়েকটি সুপারিশ রেখেছেন।

(ক) উপজেলাকে এমন বোঝা চাপানো ঠিক হবে না যা সে বহন করতে পারে না।

(খ) সুদূর কেন্দ্রে বসে সরকারের পক্ষে ৪৬০টি স্বতন্ত্র সমস্যা জর্জরিত উপজেলাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। প্রকল্প সমূহ চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি উপজেলা পরিষদের ব্যাপারে জেলা প্রশাসককে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। উপজেলা পরিষদের হিসাব নিরীক্ষা করার দায়িত্ব কম্পট্রলার এণ্ড অডিটর জেনারেলের। কিন্তু প্রায় দেখা যায় অডিট আপত্তির রিপোর্ট এত দেরীতে পৌঁছে যে এর উপরে আর কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তিনি সুপারিশ করেন যে অডিট আপত্তির রিপোর্ট তড়িৎ গতিতে জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠাতে হবে যাতে করে জেলা দুর্নীতি দমন কমিটির সভাপতি হিসাবে জেলা প্রশাসক সময়মত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যদের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে এ ব্যাপারে কোন ধরাবাধা নিয়ম করার প্রয়োজন নেই, কারণ উপজেলার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সংসদ সদস্যদের প্রশ্ন তোলার ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

আমলাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন যে মাত্র দু'বছরের সময়ের মধ্যে ৪৬০টি উপজেলা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর ফলে অনেক অদক্ষ লোককে চাকুরীতে নিয়োগ করতে হয়েছে। তিনি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার, উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মান সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে মাত্র তিন মাসের প্রশিক্ষণ দিয়ে ৪৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে মাঠে পাঠানো হয়েছে এবং এদের জন্য আইন শিথিল করে বিভাগীয় পরীক্ষা মাফ করে দেয়া হয়েছে।

সবশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে এক নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে ঘিরে উপজেলা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। তিনি মনে করেন সরকারী কর্মকর্তাদের মান বাড়াতে না পারলে সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উপজেলায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের প্রয়োজন আছে---একথা আমরাও স্বীকার করি কিন্তু রাতারাতি তা সম্ভব নয়। ডঃ আলী একজন উর্দ্ধতন সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকেবহাল। তিনি ভাল করে জানেন যে কর্মকর্তাদের দ্রুত মান উন্নয়ন এর জন্য সরকারের হাতে এমন কোন আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই। উপজেলার প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে যে পরিস্থিতিতে বহুসংখ্যক কমকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে তা সকলের জানা। ডঃ আলীও সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাই বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে উপজেলা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালেই ভাল হতো। এ প্রসংগে মরহুম ব্রিগেডিয়ার ইউসুফ হায়দারের "ডেভলপমেন্ট দা উপজেলা ওয়ে" বইটির কথা উল্লেখ করা যায়। মরহুম ইউসুফ হায়দার অতি সহজ ভাষায় বলেছেন যে উপজেলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে স্থানীয় নেতৃত্ব, সরকারী কর্মকর্তা ও জনসাধারণের সমন্বয় ও সুসম্পর্কের উপর। তার মতে যেখানে এ তিনটির সমন্বয় আছে সেখানে উপজেলা পদ্ধতি টিকে থাকবে আর যেখানে এ তিনটির সমন্বয় থাকবে না সেখানে জটিলতা দেখা দেবে। তিনি অবশ্য উপজেলা চেয়ারম্যানদের প্রশিক্ষণ ও তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে ডঃ আলী নাচোল ও পলাশবাড়ী উপজেলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। কিন্তু দেশে এমনও উপজেলা আছে যেখানে সরকারের নির্দেশমত সুষ্ঠুভাবে কাজ চলছে। এ ধরণের উপজেলার দৃষ্টান্ত তুলে না ধরায় বিষয়টি একেবারে এক তরফা হয়ে গেছে। উপজেলা সৃষ্টির ফলে বিচার ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ কি এ নতুন ব্যবস্থার সুফল ভোগ করতে পারছে ? উপজেলায় নিয়োজিত ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন কিনা, তাঁদের পক্ষে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ মোকাবেলা করতে হয় কিনা এবং এ পরিস্থিতিতে বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব কিনা---এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ও এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ভালো হতো।

যা হোক বহু পরিশ্রম করে বাংলাদেশের রাজনীতি, উন্নয়ন ও উপজেলার উপর এমন একটি সুন্দর বই লেখার জন্য আমরা ডঃ আলীকে অভিনন্দন জানাই। সুন্দর ও প্রাণঞ্জল ভাষায় বর্তমান সরকার আমলের রাজনীতি, উন্নয়ন ও উপজেলার উপর তিনি এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করেছেন যা পড়ে এ দেশের মানুষ উপকৃত হবে। বইটি বাংলায় লেখা হলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে দেশের রাজনীতি, উন্নয়ন ও উপজেলা সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানা সম্ভব হতো। তাই বইটির বঙ্গানুবাদ করার জন্য লেখককে অনুরোধ জানাই। উপজেলা সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ সমূহ সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ২৪৭ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য ধরা হয়েছে ১৭৫·০০ টাকা। মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পের এ সংকটময় মুহূর্তে বইটির মূল্য যুক্তিসংগত মনে হলেও তা সাধারণ পাঠকের ক্রয় সীমার কিছুটা বাইরে চলে গেছে। বইটির মুদ্রণ সুন্দর ও পরিমার্জিত। মলাট ঝকঝকে তকতকে। প্রচ্ছদ প্রতীক ঢংয়ের না হয়ে সহজ ও স্বাভাবিক হলে পাঠকের কাছে আরো বেশী আকর্ষণীয় হতো।

—খবির উদ্দিন আহমেদ।

লেখক পরিচিতি

ডঃ শেখ মাকসদ আলী বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য। উন্নয়ন অর্থনীতিতে তিনি যুক্তরাজ্য থেকে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের তিনি প্রতিষ্ঠাতা রেক্টর ছিলেন।

ডঃ আকবর আলী খান বর্তমানে ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক মিনিষ্টার পদে কর্মরত আছেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। কানাডা থেকে অর্থনীতিতে তিনি পি, এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

মোঃ সফিউর রহমান বর্তমানে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সরকারী পদ্ধতি অনুবিভাগের পরিচালক। তিনি সাবেক নিপার সিনিয়র ইনষ্ট্রাকটর ছিলেন।

নাসিরউদ্দীন আহমেদ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)-এর সদস্য। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উন্নয়ন অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন।

খবির উদ্দীন আহমেদ বর্তমানে ঢাকাস্থ আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উপ-পরিচালক। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)-এ যোগদানের পূর্বে তিনি রাজশাহী কলেজে ইংরেজী বিভাগের প্রভাষক পদে কর্মরত ছিলেন।

আব্দুল মতিন বর্তমানে কেন্দ্রের গ্রন্থাগারিক হিসেবে কর্মরত। সুদীর্ঘ এক যুগেরও বেশী সময় ধরে তিনি গ্রন্থাগার পেশায় নিয়োজিত।

লেখকের জ্ঞাতব্য

প্রশাসন সমীক্ষায় প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রশাসন সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিবন্ধ ও গবেষণা টীকা মুদ্রিত হয়। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লেখককে পাণ্ডুলিপির ৪টি অনুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। নিবন্ধ ও গবেষণা টীকা মুদ্রাক্ষরিত কাগজে যথাক্রমে ৪০ ও ২০ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বান্ছনীয় নয়। প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ প্রবন্ধের শেষ পাদ টীকা ও প্রয়োজনে গ্রন্থপঞ্জী হিসাবে বর্ণিত হতে হবে।